সত্যজিতের ‘‘দুষ্টু লোক’’

নির্মাল্য কুমার ঘোষ,
সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
গৌরমোহন শচীন মন্ডল মহাবিদ্যালয়

১

‘‘দুষ্টু লোক’’ শব্দযুগলের ব্যবহারে সত্যজিতীয় অর্থে যে ভিলেন বোঝাতে চাইছি, সেটুকু বোঝার যেমন কোনো অসুবিধা নেই, তেমনি ওই ‘‘দুষ্টু লোক’’ শব্দবন্ধের ব্যবহারেই যে বড়দের জগতকে এড়িয়ে, ছোটদের জগতে প্রবেশের একরকমের চাবিকাঠি আমরা খুঁজে নিতে চাইছি, তা বুদ্ধিমান পাঠকমাত্রেই ধরতে পারবেন। প্রবন্ধের নামকরণ তদুপরি বিষয়বস্তু নির্বাচনের এই সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে, আত্মগ্লানি মোচনার্থে কিছুটা সাফাই দিয়ে রাখা আমাদের পক্ষেও প্রয়োজনীয়। প্রথমত, এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের পরিসরে আমরা সত্যজিতের সিনেমাকে আলোচনার আওতাভুক্ত করিনি। কারণ সত্যজিৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অন্য কারো সাহিত্যকীর্তিকে নির্ভর করে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সেই সব ক্ষেত্রে ভিলেনের নির্মাণেও সত্যজিতের যতটা কৃতিত্ব রয়েছে, হয়তো সমজাতীয় বা অধিক কৃতিত্ব স্বয়ং ঔপন্যাসিক বা ছোটগল্পকারের থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা। ফলে, ‘সীমাবদ্ধ’-য় শ্যামলেন্দুর উত্থান, যা আসলে তার পতন, তার জন্য যতটা সত্যজিৎ দায়ী, সমপরিমাণে দায়ী শংকর। ‘ঘরে বাইরে’-র সন্দীপ, ‘অশনি সংকেত’-এর যদুপোড়াকেও আমরা সযত্নে পরিহার করছি একই যুক্তিতে।[১] দ্বিতীয়ত, আমরা ‘‘দুষ্টু লোক’’ বলতে সত্যজিতের মুখ্যত ছোটদের জন্য লেখা, আরো সংকীর্ণ অর্থে ফেলুদার গোয়েন্দা-গল্পের ‘দুষ্টু লোক’’-দের কথাই আলোচনা করব। প্রসঙ্গের টানে হয়তো চলে আসবে সত্যজিতের অন্যান্য লেখার খলনায়কেরা। তারই সূত্র ধরে আমাদের আলোচনা বুঝে নিতে চাইবে সত্যজিতের মনন ও মানসকে।

২

১৯৭৯-এর ‘হত্যাপুরী’ উপন্যাসে, ট্রেনে যাওয়ার সময়ই আপাদমস্তক ‘‘সোনায় মোড়া’’ এক অ-বাঙালির সঙ্গে বার্থ শেয়ার করে ফেলুদারা। ‘‘রিজার্ভেশন চার্ট’’ দেখে ফেলুদা জানায়, ভদ্রলোকের নাম ‘‘এম. এল. হিঙ্গোরানি’’। ধনী ব্যবসায়ী ‘‘সোনায় মোড়া মিঃ হিঙ্গোরানি’’-র সঙ্গে ফেলুদাদের আবার মোলাকাত হয় পুরীতে। রাত্রে, সি-বিচে— ‘‘ভদ্রলোক আমাদের দেখে থমকে দাঁড়ালেন; তারপর ফেলুদার দিকে আঙুল নেড়ে বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, ‘ইউ বেঙ্গলিজ আর ভেরি স্টাবর্ন, ভেরি স্টাবর্ন’।’’ জাতিগতভাবে এই আক্রোশ প্রকাশের কারণ কী, ফেলুদা তা জানতে চাইলে, হিঙ্গোরানির ঝুলি থেকে বিড়াল বের হয়। দুর্গাগতিবাবুর পুঁথি-সংগ্রহ থেকে ‘‘প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি’’ কিনতে চেয়েছিলেন তিনি, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন— ‘‘আই অফার্ড হিম টোয়েন্টি ফাইভ থাউজ্যান্ড, অ্যান্ড হি স্টিল সেড না!’’ ‘‘মানুষ নির্লোভ হতে পারে’’ এ’কথাটাই মানতে চায় না হিঙ্গোরানির মতো সবকিছু টাকায় কিনতে-চাওয়া নিছক ব্যবসায়িক বোধ-সম্পন্ন

বড়লোকরা। এঁরা মুখ্যত অ-বাঙালি আর কিনে নিতে চায় বাঙালির ঐতিহ্য-সম্পদ। তা সে পুঁথি হোক বা কোনও প্রত্ন-সম্পদ। শুধু কিনে নিতে চায় না, প্রয়োজনে ছলে-বলে-কৌশলে হাতাতে চায় সে-সব। মহেশ হিঙ্গোরানিকে তো চেনেন না মিস্টার সেন।" ''এম. এল. হিঙ্গোরানি"-র পুরো নাম তবে কি মহেশলাল হিঙ্গোরানি? ফেলুদার ভাষায় দুর্গাগতিবাবুর পুঁথির ''আসলগুলো পাচার হয়ে গেছে হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে।" ফেলুদার গল্পমালায় বারবার তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ফিরে আসে এই ''হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের" লোকজন।

১৯৭৭ সালে 'গোরস্থানে সাবধান!'-এ আবির্ভূত হন ''হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের" polished চরিত্র মহাদেব চৌধুরী— ''বাঙালি হলেও মনে হয় পশ্চিম-টশ্চিমে মানুষ। ভাঙা-ভাঙা বলেন বাংলা। বেশিরভাগ ইংরিজিই বলেন।" ধুরন্ধর, ঠাণ্ডা মাথার মানুষ মহাদেব চৌধুরী নিজের প্রাপ্তির পথে, নেতিবাচক যে-কোনও পন্থা অবলম্বনে বিশ্বাসী। অর্থের জোরে খারাপ কাজের দোসর যোগাড় করে রেখেছে মানুষটি; ফেলুদার ভাষায়— ''এসব লোককে দাবিয়ে রাখা যায় না রে। পুলিশও কিছু করতে পারে না।" ''হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের" মানুষদের অন্যতম চারিত্রলক্ষণ অপরিসীম লোভ। মহাদেব চৌধুরীকে বলা ফেলুদার সেই তীক্ষ্ণ মন্তব্যটি মনে পড়ে?— ''লোভ জিনিসটা তো আপনার একচেটিয়া, মিঃ চৌধুরী।" মহাদেব চৌধুরীর ''যথার্থ দোসর" 'টিনটোরেটোর যীশু' উপন্যাসের হীরালাল সোমানি। ''সাহেব কালেক্টর" ক্রিকোরিয়ানকে সে বেচতে চায় যীশুর ছবিটি। এই জাতীয় আরেক চরিত্র 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' উপন্যাসের সিংঘানিয়া। সে-ও উপাধ্যায়ের কাছে থাকা সোনার বালগোপালের মূর্তিটি ''পাঁচ লাখ টাকা" দিয়ে কিনে নিতে চায়। ফেলুদার শেষ কাহিনি 'রবার্টসনের রুবি'-তে ফেরত আসবেন ''হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের" আরেক অপেক্ষাকৃত নিরীহ চরিত্র, দুবরাজপুরের ''ধনী ব্যবসায়ী", জি. এল. ঢানঢানিয়া ওরফে গণেশলাল ঢানঢানিয়া। চৌবে ঢানঢানিয়া সম্পর্কে বলে— ''এর নানারকম সব ধোঁয়াটে কারবার আছে।" 'রবার্টসনের রুবি' গনেশলাল কিনতে চায়।

এই ''হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের" কল্পনা সত্যজিতের এক বিশেষ ধারণার মূর্ত রূপায়ণ। অ-বাঙালি এক লোভী মানুষ, থাবা বসাচ্ছে বাঙালির ঐতিহ্যে, বিক্রি করে দিতে চাইছে বাঙালির নিজস্ব সম্পদ, ছলে-বলে-কৌশলে— এই বিশেষ ধারণাকে কোনও একভাবে সত্যজিৎ আজীবন মনে মনে পোষণ করেছেন। গণেশলাল ঢানঢানিয়া, হীরালাল সোমানি, মহাদেব চৌধুরী, মি. সিংঘানিয়া বা মহেশলাল হিঙ্গোরানি এরই রকমফের। ফেলুদা-গল্পমালার বাইরেও, সত্যজিতের অন্য রচনাতেও, এদের অস্তিত্ব রয়েছে। আমাদের মনে পড়বে, ইংরেজিতে লেখা স্ক্রিপ্ট 'দ্য এলিয়েন'-এর শ্যামলাল বাজোরিয়াকে। সত্যজিতের ''ম্যাকেঞ্জি ফ্রুট" আবিষ্কারের কৃতিত্ব নিশিকান্ত বসুর। স্থানীয় জমিদার বংশের জ্ঞানপ্রকাশ চৌধুরীর মারফত এই ফলের খবর পেলেন অবাঙালি এক ভদ্রলোক চুনিলাল মানসুখানি। নিশিকান্তবাবুর আবিষ্কৃত ফলকে অনায়াসে করায়ত্ত করে নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দিলেন ব্যবসাদার মানসুখানি। আর শেষমেশ যে বাগান থেকে এই ফল আবিষ্কার করেছিলেন সেই বাগানই হয়ে গেল তাঁর জন্য ''অচলায়তন"।

৩

সত্যজিতের গল্পে এই যে অবাঙালি দালাল চরিত্রগুলি খলনায়কের ভূমিকায় ঘুরে-ফিরে আসে, এর পিছনে সত্যজিতের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছিল, এমন ভাববার থেকেও, আমরা আরো বেশি করে মনে করতে পারি বাঙালির এক সুদীর্ঘ ঐতিহ্যের কথা, যে ঐতিহ্যে অবাঙালি, বিশেষত মাড়োয়ারিদের প্রতি এক রকমের অম্ল-মধুর ধারণা পোষণ করে এসেছেন বাঙালি সাহিত্যিকেরা। মারোয়াড় তথা রাজপুতানার সঙ্গে বাঙালির যোগ বহুকালের। কর্নেল জেমস টডের মহাগ্রন্থ 'অ্যানালস অ্যান্ড অ্যান্টিকুইটিস অফ রাজস্থান'-এর বদান্যতায়, বাংলা সাহিত্যে, উনিশ শতক জুড়ে, মুহুর্মুহু শোনা গিয়েছে মরুসিংহের গর্জন।[২] এর জের চলেছে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যেও। বহুদিন পর্যন্ত বাঙালি শিশু-কিশোরদের হিন্দু জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত করে এসেছে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিস্মরণীয় 'রাজকাহিনী'। বিশ শতকের তৃতীয় দশক থেকে, আমরা লক্ষ করি, মেবার মাড়োয়ারের ''সিংহ''-রা ''গমিতমহিমা''। কেন এই পরিবর্তন? 'মাসিক বসুমতী'-তে ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে ছাপা হয় প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রবন্ধ 'সভ্যতার সোপানে না জাহান্নামের পথে?'। বাঙালির মাড়োয়ারি-অপ্রীতির কারণগুলি বুঝে নেওয়া যাক এই রচনাটি থেকে— ''কলিকাতার রাজপথে বাহির হইলে দেখিতে পাই, নিত্য নূতন অ-বাঙ্গালীর মুদীর দোকান, ময়রার দোকান, ফলফুলুরির দোকান গজাইয়া উঠিতেছে। বাজারে আলু, পটল, তরিতরকারী, চাউল-দাইল, মৎস্য-মাংসের স্টলও ক্রমশঃ অবাঙ্গালীর হস্তগত হইতেছে। গাড়োয়ান, মুটে-মজুর, রাজমিস্ত্রী, দপ্তরী, ছুতারমিস্ত্রী এ সকল পেশা ত বহুদিন হইতে বাঙ্গালীর হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। রাস্তার গ্যাসের বা জলের মিস্ত্রী বা বাগানের মালী কাহারা, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই।" এই ''অবাঙ্গালী''-দের মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্র লক্ষ করেছেন ''গুজরাটী'', ''ভাটিয়া'' বা ''মাড়োয়ারী''-দেরই। শুধু এই নয়। শহর কলকাতার বুকে মাড়োয়ারি ব্যবসাদারদের অসাধুতা কি চোখে পড়েনি 'বেঙ্গল কেমিক্যালস'-এর কর্ণধারের? নিশ্চয়ই চোখে পড়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্র রায় যেমন লক্ষ করেছিলেন সেই অসাধুতা, তেমনি লক্ষ করেছিলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যালস'-এর সর্বময় কর্তা প্রফুল্ল রায়ের ভাবশিষ্য রাজশেখর বসুও। পরশুরামের ছোটগল্পে, তাই ভিড় করে আসে, একগাদা অসাধু মাড়োয়ারি অবাঙালি ব্যবসায়ী চরিত্র, যাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া। পরশুরামের লেখার ভক্ত সত্যজিৎ রায়, 'মহাপুরুষ' সিনেমার একটি চকিত দৃশ্যে ফিরিয়ে আনেন বাটপাড়িয়ার স্মৃতি—

''গণেশ : (বাবাকে) আচ্ছা বাটপাড়িয়াকে ঢুকতে দিই না?

বাবা : যে সেই তেতলা আশ্রম করে দেবে বলেছে?

গণেশ : হ্যাঁ। উইথ কুলিং সিস্টেম অ্যান্ড লিফট।"

আর পরবর্তী একটি দৃশ্যে লক্ষ করি—

''পিছনে প্রচুর দানসামগ্রী নিয়ে মাড়োয়ারি ভক্তকে আসতে দেখা যায়।

গণেশ : আইয়ে বাটপাড়িয়া জি।

বাটপাড়িয়া : নমস্তে, নমস্তে গণেশবাবু। —

বাটপাড়িয়া : (হেসে) হাঁ, আজ দরশন হোবে তো?

গণেশ : আরে হোবে হোবে, জরুর হোবে। আপনার দর্শন হবে না তো কার হোবে? আপনি বাবাজিকো শ্রীচরণ মেঁ যে রেটে সব দেতা-থোতা না— হোবে হোবে, টেন পার্সেন্ট হোবে।"

বাটপাড়িয়ার আগেও অবশ্য সত্যজিতের সিনেমায় মাড়োয়ারি চরিত্র এসেছে এবং বলাই বাহুল্য সেও সেই পরশুরামের গল্পেই। পরশুরামের 'পরশপাথর' অবলম্বনে তৈরি সিনেমায়, সত্যজিৎ পরশুরামেরই 'লক্ষ্মীর বাহন' গল্প থেকে ধার করেছেন কৃপারাম কাচালু চরিত্রটিকে। কৃপারাম কাচালুও অসৎ অর্থগৃধ্নু ব্যবসায়ী। তার বাড়িতেই এক পার্টিতে পরেশবাবু ফাঁস করে ফেলেন পরশপাথরের রহস্য। পরদিন কৃপারাম উপস্থিত হন পরেশবাবুর বাড়িতে —

''কাচালু : কালকে তো বড় জোর খেল দেখলাইয়েছেন, আমার গেস্টরা সব বুঝল কি আপনি কোই ম্যাজিশিয়ান আছেন।

পরেশ : তা আপনি কী বুঝলেন?

কাচালু : উঁহু। টোয়েন্টিফোর ক্যারাটস, আমি কৃপারাম।"

ধূর্ত এই মানুষটির পরবর্তী প্রস্তাব—

''কাচালু : একঠো সিধা বাত বলি পরেশবাবু?

পরেশ : বলুন।

কাচালু : আপনার যে ফর্মূলা আছে না, ও হামাকে দিয়ে দেন। আপনি ভি বিজনেস করেন— হামি ভি করি। কী বলেন?"

কালোবাজারি, অসততা— এসবের সঙ্গে বিশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে, বাঙালির কাছে সমীকৃত হয়ে উঠেছিল মাড়োয়ারি ব্যবসাদাররা। ১৯৬২ সালে, সত্যজিৎ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে যে 'অভিযান' চলচ্চিত্রটি তৈরি করেন, সেখানেও আসে ভেজালের কারবারি অসৎ মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী সুখনরাম। শুধু ব্যবসায় অসততা নয়, সেই সঙ্গে অনিচ্ছুক গুলাবীর শরীরটাকেও জোর করে ভোগ করতে চায় সে। এই খারাপ মাড়োয়ারিটির হাত থেকে, শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের রাজকন্যাকে উদ্ধার করে প্রকৃত রাজপুত নরসিং। এই গন্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া, কৃপারাম কাচালু বা সুখনরামদেরই যোগ্য উত্তরসূরী সত্যজিৎ রায়ের অবিস্মরণীয় চরিত্র মগনলাল মেঘরাজ।

৪

''হিঙ্গোরানি সম্প্রদায়ের"-ই শ্রেষ্ঠ রত্ন, মগনলাল মেঘরাজ। Andrew Robinson-এর 'The inner Eye' বইতে দেখি মগনলাল সম্পর্কে সত্যজিৎ বলছেন— "He's a very polished and ruthless kind of baddie ..... He is certainly the most ferocious character that I have created. I wanted a

really colourful and cruel villain ..... a strong adversary for Felu." জটায়ুর ভাষায় যাঁকে বলা চলে, ফেলুদার ''দুর্ধর্ষ দুশমন"! আর তোপসের মতে— ''ফেলুদার জীবনে সবচেয়ে ধুরন্ধর ও সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী।" স্বয়ং ফেলুদাই তোপসেকে এঁর সম্পর্কে বলেছিল— ''এইরকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপসে। এসব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা টনিকের কাজ দেয়। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য' গল্পে তোপসে মগনলাল মেঘরাজের কথা শুনে লেখে— ''আর কতবার এই লোকটার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে? প্রতিপক্ষ হিসেবে এর চেয়ে সাংঘাতিক আর কাউকে কল্পনা করা যায় না।" এ'বিষয়ে অবশ্য সেরা দিকনির্দেশী মন্তব্য জটায়ুর— ''এই রাহু থেকে আমাদের মুক্তি নেই। এবারে আর কী খেল দেখাবে কে জানে।" ঠিকই তো। প্রদোষ''চন্দ্র"-এর জন্য ''রাহু"-ই বটে মগনলাল। তবে প্রদোষ''চন্দ্র" কখনোই পুরোপুরি ''রাহু"গ্রস্ত হয় না।

কে এই মগনলাল? ছাত্রাবস্থায় কলকাতার কলেজে পড়াশুনা করেছে এই মাড়বার-পুঙ্গবটি। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসে উমানাথ ঘোষাল ফেলুদাকে বলে— ''আমার নিজের ছাত্রজীবন কাটে কলকাতায়। কলেজে থাকতে দু-একটি বন্ধুকে আমি গল্পচ্ছলে গণেশের কথা বলেছিলাম। তার মধ্যে একটি বন্ধু— অবিশ্যি এখন তাকে আর বন্ধু বলি না— সম্প্রতি কাশীতে রয়েছে। তার নাম মগনলাল মেঘরাজ।" মগনলাল যে ''মাড়োয়ারি" সেকথা জানা গেল কী করে? 'গোলাপী মুক্তা রহস্য' গল্পে জয়চাঁদ বলেন— ''এক ভদ্রলোক— পশ্চিমা কিংবা মাড়োয়ারি হবে"। মগনলাল ব্যবসায়ী। অনেক রকমই বিজনেস তাঁর। তার মধ্যে ''প্লাইউডের ফ্যাক্টরি"-র কথা জানা যাচ্ছে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' থেকে। 'যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে' উপন্যাসে নিজের মুখেই বলে সে— ''সুদের কারবার আমার একটা আছে ঠিকই"। কলকাতায় ''বড়বাজারের গদি" ছাড়া বাড়ি আছে কাশীতে। সংসারী মানুষ। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসে তার পুত্র সুরযলাল মেঘরাজের কথাও পেয়েছি আমরা। ''পয়সা আর দাপট"-এর দিক থেকে একমেবাদ্বিতীয়ম, যদিও ''চোরাকারবার, কালোটাকা"-ই মগনলালের যথার্থ পরিচয়। 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-এ মগনলাল সম্পর্কে জয়চাঁদও বলেন— ''তিনি অনেক কিছু কালেক্ট করেন। কথায় বুঝলাম সেসব জিনিস তিনি ভালো দামে বিদেশে পাচার করেন। জামাকাপড়, হাতের আংটি, কানের হীরে ইত্যাদি দেখে মনে হলো খুব মালদার লোক।" 'যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে' উপন্যাসে দেখি মগনলালের পরিচয়— ''ভেরি বিগ আর্ট ডিলার।" সে নিজেই বলে— ''আমি আর্টের কারবারি সেটা তো আপনি জানেন, আর নেপালে যে আর্টের ডিপো, সেটাও আপনি নিশ্চয়ই জানেন।" কেমন ''আর্টের কারবারি" মগনলাল? 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর চিত্রনাট্যে দেখি পুরনো বন্ধু উমানাথ মগনলালকে বলেন— ''গুজব শুনি তুমি নাকি দেশের— মানে, যাকে বলে শিল্পসম্পদ— পুরোন ছবি, পুরোন মূর্তি— এসব নাকি বাইরে কারোর কাছে.....? American-রা সব মোটাসোটা টাকায় কিনে নিচ্ছে?" নিজেকে ''আর্টের কারবারি" বলা এই মানুষটি সম্পর্কে, তাই ফেলুদার স্পষ্ট মন্তব্য— ''দালালি করাই হচ্ছে ওঁর ব্যবসা।"

এই মানুষটির সঙ্গে ফেলুদার প্রথম টক্কর 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ। উমানাথ ঘোষালের পারিবারিক অমূল্য শিল্পকর্ম গণেশ মূর্তিটি ''চল্লিশ হাজার" টাকায় কিনতে চান মগনলাল। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' সিনেমার চিত্রনাট্যের প্রথম খসড়ায় দেখি মগনলাল ''কঠিন" স্বরে উমানাথকে বলে— ''সকল-এর কাছে আমি জিনিস

চেয়ে নেইনা উমানাথ। দরকার হলে নিয়ে নেই। তাতে আমার পয়সাও লাগে না। I take what I want।" আর উপন্যাসে উমানাথ রাজি না-হওয়ায়, সে— ''শাসিয়ে যায় যে জিনিসটা ও হাত করে তবে ছাড়বে।" সেই হাত-করার পথেই মগনলালের নির্দেশেই হত্যা করা হয় পটুয়া শশীবাবুকে। অ্যান্ড্রু রবিনসনকে মগনলাল সম্পর্কে সত্যজিৎ বলেছিলেন "ferocious character"। সিনেমাতে মগনলালের হিংস্রতা এবং ধূর্ততার পরিচয় মেলে একটি বিশেষ দৃশ্যে। ফেলুদার সঙ্গে টেলিফোনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে সে। কী উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য দু'টো। প্রথমটি তার ধূর্ততার পরিচায়ক। মগনলাল ফেলুদাকে ঘুষ দিয়ে তদন্ত বন্ধ করাতে চায়। আর প্রমাণ করতে চায়— ''চোর তো আপনার মক্কেল নিজে।" ''উমানাথের দেনা"-র ইঙ্গিত করে ''তিস হাজার ক্যাশ"-এর মাধ্যমে যে গণেশ হস্তান্তর হয়ে গিয়েছে, তা মগনলাল বোঝাতে চায় ফেলুদাকে। কিন্তু ফেলুদার— ''অর্ডিনারি বুদ্ধি না, এক্সট্রা-অর্ডিনারি বুদ্ধি।" তাই ফেলুদা মগনলালের সিদ্ধান্তে সায় দেয় না। তখনই দেখা যায় মগনলালের হিংস্রতা— ''মগনলালের তলার ঠোঁটটা বিশ্রীভাবে নীচের দিকে ঝুলে পড়ল, আর তার ভুরু জোড়া আরো নেমে এসে চোখ দুটোকে অন্ধকারে ঠেলে দিল।" ''আপনি আমার কথা বিসোয়াস করছেন না?" ফেলুদার অবাধ্যতার শাস্তি পেতে হল লালমোহনবাবুকে। ''বন্ধু" লালমোহন গাঙ্গুলিকে ''নাইফ-থ্রোয়িং"-এর তক্তার সামনে দাঁড়াতে হল। আর ''রক্ত বরফ" করে-দেওয়া সে-দৃশ্য পিস্তলের মুখে দাঁড়িয়ে বাধ্যত দেখতে হল ফেলুদাকে। বিদায় দেওয়ার আগে স্পষ্ট কথায় এর নিহিতার্থ বুঝিয়ে দিল মগনলাল— ''আপনি জেনে রাখবেন মিস্টার মিত্তির যে, আপনি বাড়াবাড়ি যা করবেন তা অ্যাট ইওর ওন রিসক। আর আপনার উপর নজর রাখার বেওস্থা আমার আছে সেটাও আপনি জানবেন।" স্বয়ং গোয়েন্দাকে নয়, গোয়েন্দার একান্ত-আপন কাউকে ভয় দেখিয়ে, গোয়েন্দাকে চাপে রাখাই মগনলালের বৈশিষ্ট্য। তাই 'যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে' আবারও তাঁর টার্গেট ''আঙ্কল" লালমোহনবাবু। এবার তাঁকে মগনলাল চায়ে মিশিয়ে খাইয়ে দেন ''এল.এস.ডি." আর শেষবার 'গোলাপী মুক্তা রহস্য'-এ লালমোহনবাবু মগনলালের আদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে বাধ্য হন। এখানেই ক্রুদ্ধ ফেলুদা মগনলালকে জিজ্ঞাসা করে— ''আপনি বারবার ওঁকে নিয়ে এমন তামাশা করেন কেন বলুন ত?..... উনি আপনার কী ক্ষতি করেছেন?" মগনলাল এর জবাবে বুঝিয়ে দেয় তার সরীসৃপ-মানসিকতা— 'নাথিং। দ্যাট ইজ হোয়াই আই লাইক হিম।" আমাদের মনে পড়ে 'বঙ্কুবাবুর বন্ধু' (সন্দেশ, মাঘ ১৩৬৮) গল্পে শ্রীপতির আড্ডায় নিরীহ বঙ্কুবাবুকে উত্যক্ত করার একটি পদ্ধতি ছিল— ''জোর করে ধরে-বেঁধে গান-গাওয়ানো"।

৫

মগনলাল জালিয়াৎ তদুপরি ধর্মপ্রাণ। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' থেকে জানি ''হার্ট অফ কাশীতে" মগনলালের বাড়ি— ''জ্ঞানবাপীর উত্তর দিকে গলিটায়।" ক্যালকাটা লজের মালিক নিরঞ্জনবাবুর এ'সম্পর্কে টিপ্পনীটি উপভোগ্য— ''পরম ধার্মিক তো, তাই একেবারে খোদ বিশ্বনাথের ঘণ্টা শুনতে শুনতে টাকার হিসাব করে।" আর বাড়ির ভিতরটা কেমন? 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ তোপসে লিখেছিল— ''মগনলালের পিছনের দেওয়ালে দেবদেবীর ছবির গ্যালারি।" এহেন যে ''পরম ধার্মিক" মগনলাল, 'যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে' উপন্যাসে সে ''কর্মক্ষেত্র বদলেছে দেখে" ফেলুদা বিস্ময় প্রকাশ করলে, আশ্চর্য জবাব দিয়েছিল মগনলাল— ''বনারাস

হোলি প্লেস, কাঠমান্ডুভী হোলি প্লেস। ওখানে বিশ্বনাথজি, ইখানে পসপতিনাথজি। একই বেপার, মিঃ মিত্তর। যেখানে ধরম, সেখানেই আমার করম।" ''ধরম"-কেই কীভাবে ''করম" বানিয়ে নেয় মগনলালের মতো মানুষেরা, তার স্বপক্ষে একটা চমৎকার বক্তৃতাও দিয়েছিল সে— ''আপনি জানেন আমাদের দেশের মানুষের সবসে বড়া দুষমন কে? অ্যালোপ্যাথ ডকটরস! মাইসিন জানেন তো? সিন মানে কি? সিন মানে পাপ! পাকিট ফেঁড়ে পয়সা নেবে, হাথ ফেঁড়ে ব্লাড নেবে, পেট ফেঁড়ে পিঠ ফেঁড়ে বুক ফেঁড়ে এটা নেবে সেটা নেবে। ওয়র্স দ্যান এনি স্মাগলিং রেকেট। পেনিসিলিনসে পসপতিনাথের চরণামৃত ইজ হান্ড্রেড টাইমস বেটার। দেশের লোক যদি অ্যালোপাথি ছেড়ে দুসরা দাওয়াই খাবে তো আখেরে দেশের মঙ্গল হবে— এ আপনি জেনে রাখবেন।" অ্যালোপ্যাথির বিজ্ঞানের চেয়ে ''চরণামৃত"-র ধর্ম মগনলালের কাছে বেশি জরুরি হয়ে ওঠে। আসলে সে জানে কীভাবে দুটোকে নিয়েই ব্যবসা করতে হয়। 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ জেল-পালানো আসামি পুরন্দর রাউতকে মছলিবাবা সাজিয়ে, ''ক্রিম অফ কাশী"-দের ধর্মপ্রাণতার সুযোগ নিয়ে, তাদের বোকা বানিয়ে রাখার মগনলালের চক্রান্ত যে একশ শতাংশ পূর্ণ হয়েছিল, তা তো বলাই বাহুল্য। ''চরণামৃত"-মাহাত্ম্য-প্রচারক, ধর্ম-ব্যবসায়ী এই মগনলালই কি এরপর সত্যজিতের 'গণশত্রু' চলচ্চিত্রের ভার্গব হয়ে ফেরত আসবে না?

ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মগ্রহণ করার কারণেই হোক অথবা সমকালীন শিক্ষিত যুবকদের মতো মানসিকভাবে এক ধরনের উদার বামপন্থায় বিশ্বাস করার জন্যই হোক[৩], ঈশ্বর[৪], ধর্ম, কুসংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে সত্যজিৎ স্পষ্টতই অনীহাত্মক ছিলেন। কুসংস্কার, ধর্মীয় উন্মাদনা, ভণ্ডামি, বুজরুকির বিরুদ্ধে সত্যজিতের মন-মেজাজ তাঁর সিনেমা থেকেও আঁচ করা চলে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'দেবী' (১৯৬০), পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' থেকে 'মহাপুরুষ' (১৯৬৫), নিজের উপন্যাস অনুসরণে 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৯) এবং হেনরিক ইবসেনের নাটক অবলম্বনে 'গণশত্রু' (১৯৮৯)— এই চারটি চলচ্চিত্রেই ধর্মীয় কুসংস্কারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন সত্যজিৎ[৫]। সত্যজিতের আখ্যান-ভুবনে তাই ''দুষ্টু লোক"-দের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকে ধর্মের। সত্যজিৎ বিশ্বাস করতেন না দেবতা বা অপদেবতাকে ভাঙিয়ে, ফেঁদে বসা অলৌকিক ক্ষমতার ব্যবসায়। আর স্রষ্টার সেই অপছন্দের সামাজিক ক্ষতকে সারাবার জন্য, ''গণশত্রু" ডাঃ অশোক গুপ্তর অনেক আগে থেকেই লড়ে চলেছে প্রদোষচন্দ্র মিত্র।

অলৌকিকের বুজরুকির বিরুদ্ধে, সত্যজিতের প্রদোষ মিত্তিরের এই লড়াইয়ের অন্যতম ভরকেন্দ্র প্ল্যানচেট বা প্রেতচর্চা। 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' উপন্যাসে ১৯৭০ সালে, প্রথম সত্যজিৎ প্ল্যানচেট প্রসঙ্গ আনেন। ছদ্মবেশী শশধর বোস ওরফে ডঃ বৈদ্য প্ল্যানচেটে শেলভাঙ্কারের আত্মাকে এনে তার মুখ থেকেই জানতে পারে, তার খুনি তার ছেলে বীরেন্দ্র। আর বীরেন্দ্র ওরফে হেলমুট তখনই বুঝে যায় ডক্টর বৈদ্য ''এক নম্বরের ভণ্ড শয়তান"। প্ল্যানচেটের ছলই ধরিয়ে দেয় শশধর বোসকে। প্ল্যানচেটের ভণ্ডামি থেকে ধরা পড়ে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য ওরফে ''আত্মারামবাবু'-ও। প্ল্যানচেটের মাধ্যমে ইনি ''জীবনলাল"-এর আত্মাকে ডেকে তাকে দিয়ে জানিয়ে দেন, তার হত্যাকারী তারই পিতা। ঠিক 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'-এর উল্টো ছক আর কি! এবারেও ভেস্তে যায় আত্মারামের ষড়যন্ত্র; কারণ জীবনলাল তো জীবিত। মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যের ''ভণ্ডামি" ''শয়তানি"

আর ''লোভ''-এর অবসান ঘটে গোঁসাইপুরের প্ল্যানচেটের আসরে। 'গোঁসাইপুর সরগরম' ১৯৭৬-এর গল্প; ঠিক পরের বছর ১৯৭৭-এ সত্যজিৎ লিখবেন 'গোরস্থানে সাবধান!' তাতে ''ফোর্টিন বাই ওয়ান রিপন লেন''-এ মিঃ গডউইনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফেলুদা জানতে পারে উপর তলায় থাকে ''অ্যারাকিসের দল'' যাদের ''প্রেতচর্চা সমিতি'' আছে। মিঃ গডউইনের ভাষায়— ''চার ব্যাটা ভণ্ড টেবিলটাকে ঘিরে বসেছে। বলে মরা লোকের আত্মা নামায় ওরা...।'' ফেলুদা যখন জিজ্ঞাসা করে— ''ব্যাপারটা কি অন্ধকারে হয়?'' তখন গডউইনের তিক্ত উত্তর— ''সব বুজরুকিই তো অন্ধকারে হয়।'' এই ''প্রেতচর্চা সমিতি'' শার্লট গডউইনের ''কাসকেট''-টি নিয়ে যায় টমাস গডউইনের প্রেতাত্মা নামানোর জন্য। সুকৌশলে সেই ''কাসকেট''-টি হাতিয়ে নেয় ফেলুদা আর মিঃ অ্যারাকিসের ধারণা হয়— ''টম গডউইনের প্রেতাত্মা নিয়ে গেছে তার বাক্স।'' শার্লট গডউইনের ''ডায়রি'' থেকে ফেলুদা যে ''নস্যির কৌটো''-র কথা জানতে পারে যার ''গায়ে পান্না চুনি এবং নীলা বসানো'' সেটি সন্তর্পণে হাতিয়ে নিয়েছিল মিঃ অ্যারাকিস। ফেলুদার হাতে সেই ধাপ্পাবাজিও ধরা পড়ে।

৬

শুধু ''প্রেতচর্চা'' নয়, অলৌকিকের মুখোশে যে-কোনও রকম ভণ্ডামি-বুজরুকির বিরুদ্ধেই খড়্গহস্ত ফেলুদা ওরফে সত্যজিৎ রায়। ১৯৬৫-তে সত্যজিৎ পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা' অবলম্বনে তৈরি করেন 'মহাপুরুষ' আর ১৯৬৬-তে 'বাদশাহী আংটি' উপন্যাসেই উঠে আসে সন্ন্যাসী-সেজে-থাকা গণেশ গুহর প্রসঙ্গ। এরকমই আরেক ভণ্ড সন্ন্যাসীর কথা পাই ১৯৭১-এর 'সোনার কেল্লা'-য়। সিধু জ্যাঠার থেকে ফেলুদা জানতে পারে ডঃ হাজরার অতীত কীর্তি; ''ভবানন্দ'' নামে এক ভণ্ড সাধুর ''বুজরুকি'' ধরে-দেওয়ার কাহিনি— ''শিকাগোতে এক বাঙালি ভদ্রলোক— ভদ্র আর বলি কী করে, চরম ছোটলোক— এক আধ্যাত্মিক চিকিৎসালয় খুলে বসেছিল। এইটিনথ্ সেঞ্চুরিতে ইউরোপে আন্টন মেসমার যা করে।— সেই সময় হাজরা শিকাগোতে বক্তৃতা দিয়ে যায়।— গিয়ে ভণ্ডামি ধরে ফেলে।'' ''অমিয়নাথ বর্মন, ওরফে দ্য গ্রেট বারম্যান— উইজার্ড অফ দ্য ইস্ট''— এই ভবানন্দই 'সোনার কেল্লা'-য় নকল ডা. হাজরা সেজে ফিরে আসে। এই ভণ্ড সাধুর তালিকাতেই এরপর সত্যজিতের সেরা সংযোজন ''মছলিবাবা''। 'মহাপুরুষ' সিনেমার ডায়লগ খেয়াল করুন—

''নিবারণ : জগন্নাথ ঘাটে এক সাধু এসেছেন, বুঝলেন?

নিতাই : হুঁ।

নিবারণ : মিরচাইবাবা। (খাট থেকে উঠে) যত লোক যাচ্ছে, একটি করে মন্ত্রপূতঃ লঙ্কা খেতে দিচ্ছেন আর তাই খেয়ে সব অসুখ সেরে যাচ্ছে।''

লক্ষ্য করে দেখুন সেই ১৯৬৫ সালেই ''মন্ত্রপূতঃ মাছের আঁশ'' দেওয়া মছলিবাবা তৈরি হয়ে উঠছেন। ১৯৭৫-এর 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসে মছলিবাবার আবির্ভাব। বারাণসীতে জনৈক ভক্ত-সাধুপুরুষকে অলৌকিক বুজরুকি দেখিয়ে পসার জমান বাবাজি— ''বাবাজি নাকি প্রয়াগ থেকে গঙ্গাবক্ষে ভাসমান অবস্থায় বারাণসীতে এসে পৌঁছেছেন।'' বাবাজি ভক্তদের 'মন্ত্রপূতঃ শঙ্খ' দেন যা ব্রাহ্মমুহূর্তে ''গঙ্গায় ভাসিয়ে দিলেই''

ফলপ্রাপ্তি ঘটে। ভক্তদের মতে— ''স্বয়ং বিষ্ণু আবার মাছ হয়ে এসেছেন।'' গল্প-শেষে জানা যায় ইনি আদতে ''মগনলালের একজন স্যাঙাৎ।'' আদতে বিহারের ''পূর্ণিয়া''-র বাসিন্দা, ''জালিয়াতি''-তে পোক্ত এই মানুষটির নাম ''পুরন্দর রাউত''। সিনেমার ভাষায় শেষ পর্যন্ত ''কোতোয়ালিতে'' বাবাজির ''আঁশ ছাড়ানো হয়।''

সমকালীন বাস্তবের সাধু-সন্ন্যাসীদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন সংবাদপত্রের নিয়মিত পড়ুয়া সত্যজিত। ''সোনার কেল্লা'-য় নকল সম্পর্কে আসল ডা. হাজরার মন্তব্যটি লক্ষণীয়— ''শিকাগোতে তো এরা ছিলেন একেবারে শ্বশ্রুগুম্ফ সম্বলিত মহাঋষি মহেশ!'' সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র তাঁর বইতে লেখেন— ''সোনার কেল্লা চলচ্চিত্রে স্পষ্ট বলা আছে ভবানন্দের সন্ন্যাসী সেজে মানুষ ঠকানো ১৯৬২ সালের ঘটনা। ইতিহাসগত ভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল ষাটের দশকেই মহেশ যোগীর খবর আমরা পাই। সেই সময়ে সাধু-সন্ন্যাসীদের আন্তর্জাতিক বিস্তৃতি ঘটে।'' ১৯৬০-এর দশকে পাশ্চাত্যে ভারতীয় ''গুরু''-দের কদর তুঙ্গে ওঠে। 'বিটলস'-দের গুরু হওয়ার সুবাদে মহেশ যোগী হয়ে ওঠেন পৃথিবীখ্যাত। স্বামী ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ, শ্রীরজনীশ, স্বামী সচ্চিদানন্দ, স্বামী মুক্তানন্দ এঁদের সকলেরই উত্থান প্রায় সমকালীন। ১৯৭৮-এ প্রকাশিত 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এ দেখি অখিল চক্রবর্তী, বন্ধু মহেশ চৌধুরীকে দেয় ''মুক্তানন্দের ছবি''— ''তিনটি মহাদেশের শক্তি এঁর পিছনে''। লালমোহনবাবু এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল। বলেন— ''বিরাট তান্ত্রিক সাধু। ইন্ডিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা— সর্বত্র শিষ্য।''

অলৌকিকের বুজরুকি দেখিয়ে, মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে, বোকা বানানোয় আপত্তি ছিল সত্যজিতের। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতায় বা অলৌকিকত্বে কি অবিশ্বাসী ছিলেন সত্যজিৎ? না, একেবারেই নায়। ২৫.১১.১৯৭৮-এ শান্তিনিকেতনে সত্যজিতের এক সাক্ষাৎকার নেন অরূপ মুখোপাধ্যায়। তাতে ১৯২৯-এ রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা এবং প্ল্যানচেটে সুকুমার রায়ের সঙ্গে আলাপের বিষয়ে সত্যজিতের মতামত জানতে চাইলে, তিনি বলেন— ''দেখো, আমি নিজেকে বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী বলেই মনে করি। আমাদের এই দেখা-শোনা-জানা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পৃথিবীর বাইরে কিছু আছে কিনা জানি না। তবে অনেক বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানমনস্ক মানুষও দেখেছি সুপারন্যাচারেলে বিশ্বাসী। স্পিরিচুয়ালিজম বা মিস্টিসিজমে একটা অনুসন্ধিৎসা থাকতে পারে।'' অ্যান্ড্রু রবিনসন তাঁর 'দ্য ইনার আই' বইতে লিখেছেন— ''Ray does not know whether he believes in reincarnation, but he says 'there are so many examples of cases I think one should keep an open mind'...।'' 'গোঁসাইপুর সরগরম'-এও তোপসে লেখে— ''ফেলুদা অনেক সময়ই বলে যে মনের দরজা খোলা রাখা উচিত, বিশেষ করে আজকের দিনে; কারণ রোজই প্রমাণ হচ্ছে যে এমন অনেক ঘটনা পৃথিবীতে ঘটে যার কারণ বৈজ্ঞানিকেরা জানে না, অথচ জানে না বলে সেটাকে উড়িয়েও দিতে পারছে না।'' 'গোঁসাইপুর সরগরম'-এ ফেলুদা বলে— ''অনেক লোকের অনেক পিকিউলার ক্ষমতা থাকে যার কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।— এই যেমন সেদিন কাগজে বেরোল যে ইউরি গেলর বলে এক ইহুদী যুবক চোখের চাহনির জোরে পাঁচ হাত দূর থেকে বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা কাঁটা চামচ বেঁকিয়ে ফেলছে।'' কোনও মানুষের অলৌকিক শক্তি থাকতেই পারে, সত্যজিৎ তাতে বিশ্বাস করেন। প্রমাণ, শঙ্কুর হিতৈষী নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস। কিন্তু কেউ যদি

তার অলৌকিক শক্তির প্রয়োগ কোনো খারাপ কাজে করেন, তাহলে তা সত্যজিতের না-পসন্দ। ১৯৯২-এ সন্দীপ রায়ের জন্য গুপি-বাঘা সিরিজের তৃতীয় গল্প 'গুপি বাঘা ফিরে এলো' লিখেছিলেন সত্যজিৎ। এই গল্পের খল চরিত্র ব্রহ্মানন্দ পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিক এবং তার সিদ্ধিকে সে খারাপ কাজে লাগায়।

৭

সত্যজিৎ দাশগুপ্তকে দেওয়া ইন্টারভিউতে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন— ''মানুষের মনের মধ্যে অনেক মলিনতা থাকতে পারে যেটা কোনদিনই আমার ছবি থেকে বাদ পড়েনি। মনস্তত্বের দিকটায় আমি জোর দিয়েছি বলতে পারেন।" মানুষের মনের বিচিত্র ''মলিনতা", কীভাবে যে সত্যজিতের ফেলুদা-আখ্যানের খল চরিত্রের মধ্যে ফুটে বেরিয়েছে, তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'-এর মহীতোষ সিংহরায়কে মনে পড়ে? ''বংশের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য শিকারী হবার শখ" হয়েছিল, অথচ ''কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার"-এর কারণে তাঁর পক্ষে কোনদিনই ভালোভাবে বন্দুক ধরা সম্ভব ছিল না। সেই মানুষটির হয়ে বন্দুক ধরলেন বন্ধু শশাঙ্ক সান্যাল আর তাঁর হয়ে কলম ধরে, অনবদ্য শিকার-কাহিনি রচনা করে দিলেন সেক্রেটারি তড়িৎ সেনগুপ্ত। দু-দু'জন মানুষের প্রতিভাকে exploit করে নাম-কেনা মহীতোষ সিংহরায়কে কি আমরা ভিলেন বলবো না? ভাবতে অবাক লাগে 'বাদশাহী আংটি' উপন্যাসে বনবিহারী সরকারকে দিয়েই সত্যজিৎ বলিয়েছিলেন এর সারকথা— ''মানুষের মধ্যে দেখুন— একজনকে আপনি ভাবছেন সৎ লোক, শেষে হঠাৎ বেরিয়ে গেল সে আসলে একটা ক্রিমিনাল।" খলনায়ক সম্পর্কেই, ৭ই নভেম্বর ১৯৮১-তে শঙ্করলাল ভট্টাচার্যকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন— ''ভিলেন মানে সেই দাঁত খিঁচোনো ডাউন অ্যান্ড আউট ভিলেনের কথা বলেছি। ওটা আমার আনইনটারেসটিং বলে মনে হয়। ইনার ক্রুয়েলটি, ইনার ভিলেনি, মনের ভেতরের যে নৃশংসতা বা ভীষণ ব্যাপারটা সে তো আমার বহু ছবিতেই আছে।" ফেলুদার আখ্যানেও আমরা লক্ষ করব এই ''ইনার ক্রুয়েলটি, ইনার ভিলেনি"। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ'-এর অরুণ চৌধুরীকে স্মরণ করি। ছোট্ট একটা বাচ্চা, একদা তার বাবার যে অপকর্তির সাক্ষী হয়েছিল, গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে সেই স্মৃতিকে মনের মধ্যে জমিয়ে রেখেছে আর সেই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করেছে এক চরম মুহূর্তে, যাতে তার পিতার মৃত্যু ঘটেছে। এমন সব মানুষদের দেখা পেয়েছিল বলেই, 'রবার্টসনের রুবি'-তে যখন ইন্সপেক্টর চৌবে বলবে— 'মানুষের চেহারা দেখে সব সময় তার ভেতরটা জাজ করা যায় না মিঃ মিত্তির।' তখন ফেলুদার জবাব হবে— 'সেটা অবশ্য আমার অভিজ্ঞতাই বলে।' পূষণ গুপ্তকে বলেছিলেন সত্যজিৎ— ''এমন কোনো ফেলুদার উপন্যাস লেখার ইচ্ছা আমার নেই যাতে শুধুই বয়স্কদের জন্য উপাদান থাকবে।" কথা রাখতে পারেননি সত্যজিৎ! শেষ বয়সে, অন্তত একটি উপন্যাসে, তিনি প্লট এবং খুনি নির্বাচনে, একেবারেই ''বয়স্ক উপাদান"-কে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমরা বলছি 'ডাঃ মুনসীর ডায়েরি'-র কথা। বিমাতা ডলি মুনসী তাঁর স্বামীর প্রথম পক্ষের সন্তান শঙ্কর অপেক্ষা নিজের যমজ অক্ষম ভাই চন্দ্রনাথকে অধিক স্নেহ করেন, এবং সেই স্নেহের বশবর্তী হয়েই, স্বামী উইল করলে ভাইকে বঞ্চিত করবে ভেবে, ভাইয়ের হাতে ''হামানদিস্তা" তুলে দেন, নিজের ঘুমন্ত স্বামী ডাক্তার রাজেন মুনসীকে খুন করার জন্য— এই প্লট কি কোনভাবেই শিশু-কিশোরপাঠ্য বাংলা গোয়েন্দা গল্পের হতে পারে?

টিপ্পনী

(১) একবারই মাত্র ব্যতিক্রম দেখা গেছে। সত্যজিৎ নিজের ঠাকুরদার গল্প থেকে সিনেমা তৈরির সময় ভালো আর ''দুষ্টু'' লোকের মধ্যে জায়গা পাল্টাপাল্টি করে দিয়েছেন। উপেন্দ্রকিশোরের গল্পে হাল্লার রাজা ছিল ভালো; শুণ্ডীর রাজা খারাপ। সত্যজিতের ছবিতে হাল্লার রাজাই হয়ে দাঁড়িয়েছেন ''দুষ্টু লোক'' আর শুণ্ডীর রাজা নিষ্কলঙ্ক, পবিত্র ভালো মানুষ।

(২) দ্রষ্টব্য নির্মাল্য কুমার ঘোষ, বাঙালির কলমে অবাঙালি : একটি মিঠে কড়া প্রকল্প; রাজদীপ দত্ত স্বপন বর্মন সম্পাদিত, বাংলা সাহিত্যে অবাঙালি চরিত্র, দে পাবলিকেশনস, কলকাতা, জুলাই ২০১৮।

(৩) ১৯৭১ সালে সত্যজিৎ তৈরি করেন 'সিকিম' তথ্যচিত্র। তাতে স্পষ্ট সত্যজিতের দৃষ্টিভঙ্গি। অরূপ মুখোপাধ্যায় লিখছেন— ''পার্বত্য অর্কিডের স্বর্গরাজ্য থেকে সত্যজিতের নির্মোহ ক্যামেরা চলে আসে রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে। সেখানে রাজকীয় মহাভোজের বিপুল আয়োজন, বহু অতিথির রাজকীয় অভ্যর্থনা এবং অনিবার্যভাবে অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্যের নিদারুণ অপচয়। রাজপ্রাসাদের বাইরে সেই অপ্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু নিক্ষেপিত হয় আস্তাকুঁড়ের অন্ধকারে। সেই ঘন তমসার মধ্যে দেখা যায়, চোরের মতো ভিখারি, বুভুক্ষু, নিরন্ন প্রজারা আস্তাকুঁড়ের পরিত্যক্ত খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।'' সিকিমের রাজপরিবার সত্যজিৎকে তথ্যচিত্র তৈরির বরাত দিয়েও, কেন শেষ পর্যন্ত এই তথ্যচিত্র নিয়ে হরেক আপত্তি তুলেছিলেন, তা অনুমান করা চলে! মানসিকতার দিক থেকে আসলে একধরনের উদার বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন সত্যজিৎ। কিন্তু পার্টিলাইন মেনে তাঁর চলচ্চিত্রে বামপন্থাকে যেভাবে আত্মসাৎ করেছিলেন মৃণাল সেন, তাতে ঘোর আপত্তি ছিল সত্যজিতের। একটু ব্যঙ্গের সুরেই অভিজিৎ দাশগুপ্তকে সত্যজিৎ বলেছিলেন— ''অনেকে বলে, আপনি সদগতি করেছেন। এইবারে লেফট গভর্নমেণ্ট ভয়ানক খুশি হয়েছেন।'' তিক্ততার সঙ্গেই এই সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেছিলেন— ''আমি জানি না আজকাল মার্কসিস্ট মানে যে কী, মার্কসিজম হ্যাজ চেঞ্জড সো মাচ ওভার দ্য ইয়ারস। মার্কসের মার্কসিজম আর মার্কসিজমের মধ্যে যে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। কাজেই আজকাল আমার মনে হয়েছে, বিশেষ করে একজন ডিরেকটরকে দেখেছি যে ইফ ক্লেম টু বি এ মার্কসিস্ট তাহলেই তুমি মার্কসিস্ট। আমি আজকে আমাকে মার্কসিস্ট বলি, তাহলে সকলে বলবে, ইনি মার্কসিস্ট। এছাড়া কোনও সংজ্ঞা কিন্তু তুমি ওরকমভাবে খুঁজে পাবে না।— আমার মনে হয় যে এই মার্কসিস্ট দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোথাও একটা গলতি আছে। কোথাও বোধহয় অনেকগুলো দরজা জানলা বন্ধ আছে। তার মধ্যে পড়তে আমি রাজি নই। এইজন্য আমি যেমন 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-তেও আমার কাছে নকশাল চরিত্রটার চেয়ে তার দাদার চরিত্রটাই বেশি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হয়েছে। সাইকোলজিক্যালি ইন্টারেস্টিং।'' সত্যজিতের বামপন্থা সংক্রান্ত ধারণা বোঝবার জন্য অব্যর্থ 'প্রতিদ্বন্দ্বী'-র প্রথম ইন্টারভিউয়ের দৃশ্যটি। সেখানে সিদ্ধার্থকে জিজ্ঞাসা করা হয়— "What do you regard as the most outstanding and significant event of the last decade?" সিদ্ধার্থ ভিয়েতনাম যুদ্ধের কথা বললে ইন্টারভিউ বোর্ডের পাল্টা প্রশ্ন— "More significant that the landing on the moon?" সিদ্ধার্থ বুঝিয়ে বলে চাঁদে অবতরণ unpredictable ছিল না। ইন্টারভিউ বোর্ড তখন জানতে চায়— "Do you think that the war in Vietnam was unpredictable?" সিদ্ধার্থ ব্যাখ্যা

করে তার উত্তর— "Not the war itself, but what it has revealed about the Vietnamese people, about their extraordinary power of resistance. Ordinary people, peasants no one knew they had it in them. It isn't a matter of technology ..... its' just plain human courage." অবধারিতভাবেই এরপর ইন্টারভিউ বোর্ড সিদ্ধার্থের কাছে জানতে চায়— "Are you a Communist?" সিদ্ধার্থর বলিষ্ঠ মানবিক উত্তর— "I don't think one has to be Communist in order to admire Vietnam." স্মরণে রাখতে হবে, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে কলকাতায় আয়োজিত এক পদযাত্রায় পা মিলিয়েছিলেন সত্যজিৎ।

(৪) ১৮.৪.১৯৮৭-র সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ প্রকাশিত সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়কে সত্যজিৎ স্পষ্টাক্ষরে বলেন— ''আধ্যাত্মিকতা আপনি কিভাবে ব্যবহার করছেন জানি না, আমি কিন্তু ভগবান টগবানে বিশ্বাস করি না।" ১৯৭০ সালে 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' পত্রিকার ফোক আইজ্যাকসন সত্যজিতের ঈশ্বর-বিশ্বাসের কথা জানতে চাইলে তাঁর তাঁর স্পষ্ট উত্তর ছিল— ''আমার নিজের অনুভূতি হচ্ছে মানুষই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে, হ্যাঁ আমি তাই মনে করি। অবশ্যই প্রাণের শুরুর ব্যাপারটা নিয়ে রহস্য আছেই— কিন্তু আমার মনে হয় ঈশ্বর এমন একটা ব্যাপার নয় যাতে আমি বিশ্বাস করতে পারি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না।" বিজয়া রায় তাঁর আত্মকথায় স্পষ্টভাবেই জানান, সত্যজিৎ ''ঈশ্বরে বিশ্বাস" করতেন না।

(৫) চারটি চলচ্চিত্রের মধ্যে দিয়েই সত্যজিতের ধর্ম-ব্যবসা সম্পর্কে তীব্র বিরূপতার, কখনো ব্যঙ্গাত্মক, কখনো বা ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বিজয়া রায় 'আমাদের কথা'-য় লেখেন— ''মানিক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'দেবী' করবেন বলে ঠিক করলেন। কুসংস্কারে একেবারেই বিশ্বাসী নন বলে এই গল্পটা ওঁর খুব পছন্দ হয়েছিল।" 'ঘরে-বাইরে' নিয়ে রুশতী সেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সত্যজিৎ বলেন— '''দেবী'তে ধর্মের যে ব্যাপারটা আছে, বাঙালির পক্ষে চট করে সেটা মেনে নেওয়া কঠিন, আজও কঠিন।" ১৯৬৪ সালে 'দেবী' সম্পর্কে 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড' পত্রিকায় এরিক রোড যথার্থভাবেই লিখেছিলেন— ''কালীকিঙ্কর সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ। পুত্রবধূর দেবীত্ব তাঁর নিজের কল্পনা এবং সম্পূর্ণ অলৌকিক। এই সংস্কারাচ্ছন্নরাই শেষপর্যন্ত সনাতন ভারতকে ধ্বংস করবে। একমাত্র বিজ্ঞানের প্রমাণ ও অগ্রগতিই মুক্তি আনবে। সত্যজিৎ রায় তাঁর ছবির সময়কাল ধরেছেন শতবর্ষ আগে। একই কথা। আধুনিক ভারতের প্রসঙ্গ একেবারে পরিষ্কার। যে-কেউই বুঝতে পারবে কেন কিছু কিছু হিন্দু এই ছবি দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং এক সময় কেন এ ছবি রপ্তানির জন্য ছাড়পত্র পায়নি।" ১৯৬৫-র 'মহাপুরুষ' সিনেমায়, পরশুরামের গল্পের থেকে ভিন্ন একটি দৃশ্য সংযোজন করে, সত্যজিৎ দেখান বাবাজিদের স্বরূপ—

''বাবা হ্যাঁ। এবারে মহাদেব।

গণেশ আমি অ্যানাউন্স করে দিয়েছি।

বাবা হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে মহাদেব। পরের অমাবস্যায় বিষ্ণু, তারপরে যীশু, তারপর বুদ্ধ, তারপর হনুমান। পরপর একটা লিস্ট করে সদর দরজায় লটকে দাও না কেন।—

কেবলরাম — ফিমেল ছাড়া কমবয়সিদের বাদ দিন না। মাঝবয়সি— আপনাদের মতন, তবে ঘুঘু নয়। হয় মনে ভক্তি, নয় তো চোখে ছানি— এছাড়া নো অ্যাডমিশন।"

সহায়ক গ্রন্থ

১ অরূপ মুখোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায় বিশ্বজয়ী প্রতিভার বর্ণময় জীবন, দীপ প্রকাশন, কলকাতা, নভেম্বর ২০১৭।
২ পার্থ বসু, সত্যজিৎ রায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।
৩ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সভ্যতার সোপানে না জাহান্নমের পথে?, সূত্রধর, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫।
৪ বিজয়া রায়, আমাদের কথা, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ২০১৭।
৫ সঙ্গীতা ত্রিপাঠী মিত্র, সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা সাহিত্য ও চলচ্চিত্র, একুশ শতক, কলকাতা, জুন ২০১১।
৬ সন্দীপ রায় ও সোমনাথ রায় সম্পাদিত, সত্যজিৎ রায় সাক্ষাৎকার সমগ্র, পত্রভারতী, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০২০।

প্রবন্ধটি ০৬-০৮-২০২০ বাসন্তীদেবী কলেজের বাংলাবিভাগ এবং IQAC-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আন্তর্জালিক আলোচনাচক্রে প্রদত্ত বক্তৃতার রূপ।